মূলপাতা

গর্ভপাত ও নৈতিকতার ইতিহাস

Shamsul Arefin Shakti

2021-09-01 09:02:43 +0600 +06

14 MIN READ

নৈতিকতার (morality) ধারণাগুলো খুব দ্রুত বদলে গেছে বিগত শতকে, খুব দ্রুত। ১৬শ শতকেই নতুন শিশু অর্থনীতি (পুঁজিবাদ/ধনতন্ত্র) আভাস দিচ্ছিল যে, সামনের দিনগুলোতে ভালোমন্দ-বৈধ-অবৈধ ঠিক করে দেবে অর্থ-ব্যবসা-মুনাফা। যা ব্যবসার জন্য ভালো, তা-ই ভালো, তা-ই বৈধ। অর্থনীতিবিদ ড্যানিয়েল ফাসফেল্ড বলেন :

> ষোড়শ শতকে এই নতুন শিশু অর্থনীতি (পুঁজিবাদ) থেকে জন্ম নিল নতুন মনোভাব—বাজার-মানসিকতা, যার মূল্যবোধগুলো ভিন্ন ধরনের।... ধর্মের শিক্ষা ছিল, আর্থিকভাবেও প্রত্যেকে অপরের জন্য দায়ী। বিপরীতে নতুন এই মানসিকতায় সাফল্য লাভের জন্য প্রয়োজন অপর সকলের চেয়ে উপরে ওঠা, অপরকে পিছে ফেলা আর টেক্কা দেবার প্রচেষ্টা। ভ্রাতৃভাবের চেয়ে প্রতিযোগিতাই দরকারী মানসিকতা এই নতুন ব্যবস্থাতে।... ব্যবহারের নৈতিকতার চেয়ে সম্পদ সংগ্রহের দ্বারা মানুষ বিচার হতে লাগল।... অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝেই এই নব্য অর্থনৈতিক ধারণা একটা 'সার্বজনীন জীবনধারা'য় পরিণত হয়ে পড়ে। সেক্যুলার ও বস্তুবাদী মূল্যবোধ, যা দ্বারা পশ্চিম ইউরোপ আর উত্তর আমেরিকার মানুষ প্রভাবিত, এই নতুন দর্শনই ছিল তার ভিত্তি।

পরবর্তী শতকগুলোতে 'এনলাইটেনমেন্ট'-এর যুগে ইউরোপের নৈতিকতার যে বিবর্তন, তা যেন পুষ্টি যুগিয়েছে এই শিশু অর্থনীতিকেই। বলা হয়েছে:

- মানুষ স্বভাবগতভাবে স্বার্থপর (Thomas Hobbes)। এমন পরিবেশ করে দেয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব যাতে প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বার্থ সর্বোচ্চ চরিতার্থ করতে পারে।
- জীবনের লক্ষ্য হল সর্বাধিক সুখ চরিতার্থ করা এবং সর্বনিম্ন কষ্ট পাওয়া (maximizing pleasure and minimizing pain)। [hedonistic principle, John Locke]
- এটা করতে চাই সর্বাধিক স্বাধীনতা। জন্তু থেকে ব্যক্তি (human) তখনই হতে পারবেন, যখন হবেন 'পরিপূর্ণ স্বাধীন' (Jean-Paul Sartre)।
- আর তখনই স্বাধীন বলা হবে যখন— যখন কেউ আগের কোনো মূল্যবোধকে (ধর্ম) মেনে নেয় না। সে মূল্যবোধ-নৈতিকতা নিজে ঠিক করে। (Values are not recognaized by you, values are determined by you) । সে-ই স্বাধীন 'ব্যক্তি' যে নৈতিকতার স্রষ্টা, নিজের নৈতিকতা নিজেই ঠিক করে (creator of values) [Kierkegaard]
- রাষ্ট্রের কাজ হল: সর্বাধিক মানুষের জন্য সর্বাধিক সুখ নিশ্চিত করা (greatest good for the greatest number)। [utilitarianism, Jeremy Bentham]
- এটা করতে গিয়ে কোনো কাজ ততক্ষণই বৈধ, যতক্ষণ তা অন্য কারও ক্ষতি না করছে। [harm principle, John Stuart Mill]
- এজন্য যদি কোনো কাজে কারও সম্মতি থাকে, তাহলে তা বৈধ। সম্মতি না থাকলে অবৈধ। [consent-based model]

খেয়াল করলে দেখা যায়, এই প্রতিটি কথাই বৈধ-অবৈধের নতুন ধারণা দিচ্ছে। এভাবে এনলাইটেনমেন্টের পুরো কাঠামোটাই

পুঁজিবাদের পক্ষে কাজ করবে। ভোগ বাড়লে ক্রেতা বাড়বে, ক্রেতা বাড়লে পণ্য বেশি বিক্রি হবে, বেশি বিক্রি মানে বেশি মুনাফা— পুঁজিবাদ। যা যা এই ভোগকে নিরুৎসাহিত করে: ধর্ম, পরিবার, গোষ্ঠী, সমাজ— সবকিছুকে ভেঙে অকার্যকর করে দিতে পারলে লাভেই লাভ। আর রাষ্ট্র হবে সর্বশক্তিমান, যা সযত্নে রক্ষা করবে পুঁজিপতিদের অবাধ ব্যবসার স্বার্থ। কীভাবে করে—

আগের ধর্মভিত্তিক নৈতিকতা ভোগকে নিরুৎসাহিত করত। সুতরাং 'ব্যক্তি'র নতুন সংজ্ঞা দেয়া হল: সে নিজের নীতি নিজে ঠিক করে সে human. [humanism]। ধর্মকে ভিলেন ও মিথ সাব্যস্ত করার জন্য যা যা করার, যা যা বলার বলতে হবে। [ক]

পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য মানুষ স্বার্থত্যাগ করে, sacrifice করে, যা ভোগকে কমায়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (individualism) আদর্শের দ্বারা তৈরি হবে স্বার্থপর মানুষ, যার ফোকাস হবে শুধু নিজের ভোগ। [খ]

স্বাধীন মানুষ নিজের ইচ্ছার দাসত্ব করবে। ফলে স্বাধীনতা ভোক্তা বৃদ্ধি করবে। পরাধীন ব্যক্তির ভোগ সীমিত। এজন্য...

মালিকের অধীনতা থেকে দাসকে মুক্ত করে দাও। কিন্তু সাপ্লাই চেইনের নিচের দিকে থাকবে মডার্ন স্লেভারি। বিনা মজুরির শ্রমে উপরের দিকে মুনাফা থাকলো বেশি। [গ]

সন্তানকে বের করে আনতে হবে বাবার অধীনতা থেকে। পরিবারে বাবা সন্তানের মাঝে deterred gratification তৈরি করে— 'এখন না বাবা, পরে কিনে দেব'। বাবা না থাকলে সেই পরিবারের সন্তান হয়ে উঠবে compulsive consumer, মানে হল সে পণ্য কিনতেই থাকবে, ভোগ বাড়াতেই থাকবে— এই মানসিকতার । [ঘ]

স্বামীর অধীনতা থেকে স্ত্রীকে বের করে এনে সমতা-স্বাধীনতার কথা বলে বানানো হবে কর্পোরেট স্লেভ। নারীদের শ্রমে ফুলে ফেঁপে উঠবে বেসরকারি পুঁজিবাদ । মেয়েদের জন্য চাকরি অপশনাল, আর পুরুষের তো 'না হলেই নয়'। ফলে, পুরুষরা আগের চেয়ে কম বেতনেও শ্রম দিতে তৈরি থাকবে। [ঙ]

বেতন কম দিলে পুঁজিপতির পকেটে মুনাফা থাকবে বেশি। তাহলে নারীদের এখন শ্রমবাজারে ধরে রাখতে হবে যেকোনো মূল্যে। আর নারীদের শ্রম ধরে রাখতে হলে করতে হবে ২টা কাজ—

পরিবার গঠন-কে পেছাতে হবে স্বাবলম্বী হবার নামে। নারীদেরকে পরিবারমুখী থেকে ক্যারিয়ারমুখী করতে হবে। চাকরি, ক্যারিয়ার— এসবকে মর্যাদার কাজ হিসেবে বুঝাতে হবে। বিয়ে, গর্ভধারণ, বাচ্চাপালন-কে ছোট, ঘৃণ্য কাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যেন এগুলো করতে নারী অনীহা বোধ করে। [চ]

'আগে আগে বিয়ে'-কে ভিলেন বানাতে হবে। [ছ]

বিগত শতকের ৬০-এর দশক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়। এতোকালের হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করে এগোনো শিশু অর্থনীতিকে এবার দৌড়োতে হবে। সমাজতন্ত্রের সাথে লড়াইয়ে (স্নায়ুযুদ্ধ) পুঁজিবাদকে জিততে হবে, আরও দ্রুত ফুলে ফেঁপে ওঠার দরকার এখন। এতদিন যা টুক টুক করে করেছে, এখন করতে হবে পূর্ণ বেগে— প্রচুর শ্রমিক এবং প্রচুর ক্রেতা। যা যা কিছু ভোগকে নিরুৎসাহিত করে, অল্পে তুষ্টি এনে দেয়, 'ভোগ ছাড়া অন্য কিছুতে' জীবনের অর্থ খুঁজে পেতে সহায়তা করে; তাকে তাকে সেকেলে, প্রগতির অন্তরায় বলে প্রতিষ্ঠা করা হল— বিজ্ঞানকে ধর্মের বিপরীতে, নারীবাদকে পরিবারের বিপরীতে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে সমাজের বিপরীতে ব্যবহার করা হল। এগুলো হয়ে আসছিল আগের শতক থেকেই, এখন জোরেসোরে। যৌনতা, পরিবার, বিবাহ, নারী-পুরুষ সবকিছুর নতুন সংজ্ঞা দেয়া হল, যা এই অর্থব্যবস্থার অনুকূল। যৌনতা হল অবাধ ও স্বেচ্ছাচারী; পরিবার গঠন হল বোঝা, বিবাহ হয়ে গেল অপ্রয়োজনীয়, পুরুষের সাথে সাথে নারীও হয়ে উঠল ক্রেতা, করদাতা, ভোক্তা। চলুন দেখে আসি। **মিলিয়ে নেবেন আগের দেয়া [ক], [খ] এসব চিহ্নের সাথে ও কালারের সাথে।**

[ক] ডারউইনিয়ান বিবর্তনতত্ত্ব এবং ১৯ শতকের পুঁজিবাদের মাঝে সম্পর্ককী ছিল— তা নিয়ে গবেষণা চলছে বলে জানিয়েছেন মার্কিন বিজ্ঞান-দার্শনিক Helen Longino তাঁর Science as Socioal Knowledge গ্রন্থে। তিনি বিস্তারিত

আলোচনা করেছেন, বিজ্ঞান কীভাবে প্রভাবিত হয়। MIT-এর প্রোফেসর পদার্থবিদ Evelyn Fox Keller বলেন:

> মেইনস্ট্রীম বিজ্ঞানের ভাষা হচ্ছে আধুনিক ইউরোপীয় ও উত্তর আমেরিকান সমাজের প্রভাব বিস্তারের আদর্শ থেকে উৎসারিত। যা সৃষ্টিই হয়েছে তাদের মানসগঠনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চরিত্র থেকে।

কখনও খৃষ্টবাদকে কাটতে হবে বিবর্তনবাদ দিয়ে। কখনও ধর্মের বিপরীতে দাঁড় করাতে হবে বিজ্ঞানকে (বিজ্ঞানবাদ)। কখনও কলকেতার হিন্দু-বাঙালিত্বকে স্ট্যান্ডার্ডধরে চ্যালেঞ্জ করা হবে পূর্ববঙ্গীয় মুসলমানদের ইসলাম-ঘেঁষা বাঙালিত্বকে।

[খ] ১৯৬৯ সালে ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে প্রথম পাশ হয় no-fault divorce আইন। যদি উভয়ের যে কারও বিবাহ কন্টিনিউ করতে ইচ্ছে না করে, সে নো-ফল্ট ডিভোর্স দিতে পারে, যেখানে সঙ্গী/সঙ্গিনীর কোনো দোষ উল্লেখের প্রয়োজন নেই। অধিকাংশ পশ্চিমা দেশেই এই আইন রয়েছে। ১৯৭৫ সালে অস্ট্রেলিয়াও এই আইন করে। তাদের বিবাহ-দর্শনে কোনো দায়বদ্ধতা, কোনো স্বার্থত্যাগ, সন্তানের দিকে চেয়ে কোনো কম্প্রোমাইজের কোনো বিষয় নেই।

[গ] Global Slavery Index-2016 অনুসারে ৪৬ মিলিয়ন মানুষ modern slavery র অধীনে রয়েছে। প্রতি বছর দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ থেকে ২০ লক্ষ শিশু ইউরোপ-আমেরিকাতে পাচার করা হয় । পূর্ব ইউরোপ থেকে প্রতি বছর বহু নারী ও শিশু আমেরিকাতে পাচার করা হয় পর্নোগ্রাফির জন্য।স্বাধীনতার পর গত ৬০ বছর ধরে প্রতি বছর ফরাসী সেন্ট্রাল ব্যাংকে ৫০০ বিলিয়ন ডলার জমা দেয় ১৪টা আফ্রিকান দেশ colonial debt হিসেবে। ফ্রান্স তাদের এই শর্তেস্বাধীনতা দিয়েছে যে, মোট বৈদেশিক রিজার্ভের ৮৫% ফ্রান্সে পাঠাতে হবে। আর বাকি ১৫% দিয়ে আফ্রিকা চলবে। তাহলে, ২০১৬-১৭ তে আইভরি কোস্টের ২৩ লাখ এডাল্ট যে কোকো ফ্যাক্টরিতে দাসত্ব করে, সে দায় কি আফ্রিকার, না অন্য কারো? সেদেশের ১০-১৭ বছরের ৮৯১,০০০ শিশু যে স্কুলে না গিয়ে কোকো মাঠে নামমাত্র মূল্যে শ্রম দেয়, সে দায় কার? আফ্রিকার, নাকি যারা আফ্রিকার ৮৫% সম্পদ নিয়ে যায় প্রতিবছর, তাদের?

ILO-এর মতে, আধুনিক দাসদের কারণে বছরে ১৫০ বিলিয়ন ডলার মুনাফা হয়। Oxfam, UK-এর ethical trade manager Rachel Wilshaw বলেন:

> We know that most global companies will have modern slavery somewhere in their supply chains.

আমরা এখন জানি যে, অধিকাংশ গ্লোবাল কোম্পানিরই সাপ্লাই চেইনে কোথাও না কোথাও আধুনিক দাসপ্রথা রয়েছে। ‘টপ ৫টা ইন্ডাস্ট্রির নাম যদি বলা যায়, যারা এই দাসপ্রথার উপর মুনাফা করছে এবং টিকে আছে—-

- ইলেক্ট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রি
- গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি
- ফুড এন্ড এগ্রো ইন্ডাস্ট্রি
- সেক্স ইন্ডাস্ট্রি (বার ও নাইটক্লাব)
- ক্যাসিনো ও হোটেল

[ঘ] বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এসে পশ্চিমা সমাজে এক নতুন পরিবার-প্রথা তৈরি হল— ভঙ্গুর পরিবার (fragile family)। অবিবাহিত বাবা-মা এবং সন্তান। ১৯৭০ সালে আমেরিকায় এ ধরনের পরিবারের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো ৫ লাখ, ২০০২ এসে সেটা হলো ৪৯ লাখ । এমন এক পরিবার কাঠামো, যেটা নিজেই ভঙ্গুর,

- ১ম সন্তান জন্মের পর টিকে থাকে মাত্র ৩৫% পরিবার। নামই দেয়া হয়েছে 'ভঙ্গুর পরিবার', অর্থাৎ টিকে থাকার আশাই করা দুষ্কর।
- এই পরিবার কাঠামোতে ৭২% মা আর ৮৭% বাবা সন্তানের জন্মের পর চিন্তা করে, তারা একসাথে থাকবে কি না, চান্স ৫০-৫০।
- পেটে ১ম বাচ্চা নিয়ে ৯১% মা এই পরিবারে ভাবছে বাচ্চার বাবাটাকে বিয়ে করবে কি না, চান্স ৫০-৫০।
- ১ম বাচ্চা জন্মের টাইমেই ৫০%-এর সম্পর্কঅলরেডি শেষ। ৫ বছরের মাথায় দুই-তৃতীয়াংশ সম্পর্কঅলরেডি শেষ।
- আমেরিকায় মোট জন্মের ৪১% শিশু এই বিয়ে ছাড়া বাবামায়ের সন্তান, যাকে বলা হচ্ছে fragile family.

ছবিতে দেখুন ২০১৬ সালে ইউরোপ-আমেরিকার অর্ধেক শিশু বিবাহ-ছাড়া (out-of-wedlock) জন্ম । পশ্চিমা বিশ্বে বৃটেন তুলনামূলক রক্ষণশীল বলে খ্যাত। **সেই বৃটেনে এক-তৃতীয়াংশ বাচ্চা ব্রোকেন ফ্যামিলির । বৃটেনের ২৭ লাখ বাচ্চা থাকে শুধু মায়ের সাথে, ২ লাখ বাচ্চা শুধু বাবার সাথে, ৫ লাখ বাচ্চা থাকে বাপ কিংবা মায়ের 'লিভ-টুগেদার' সঙ্গীর সাথে, আর ৪ লাখ বাচ্চা থাকে সৎবাবা কিংবা সৎমায়ের সাথে। আমেরিকার ৫০% শিশু বাপ-মায়ের ডিভোর্স দেখে। এই ৫০%-এর ৫০% আবার বাপ-মায়ের ২য় বিয়েও ভাঙতে দেখে।**

<image>

[ঙ] ১৯৬০-এর দশকের শেষার্ধে কর্মক্ষেত্রে পুরুষের বেতন কমে যায়, বেকারত্ব বেড়ে যায়। (Hernandez 1993, Zill & Nord 1994)

[চ] ২য় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই ১৯৪৯ সালে Simone de Beauvoir-এর 'Second Sex' ব্যাপক সাড়া ফেলল।১৯৬৩ সালে Betty Friedan-এর 'The Feminine Mystique' প্রকাশিত হয়। ৩ বছরে বিক্রি হয় ৩০ লক্ষ কপি। বইয়ের বিষয়বস্তু ছিল: সন্তানপালন ও ঘরোয়া কাজকাম নারীকে হতাশ ও অসুখী করে তুলেছে, এটা। আইডিয়াটা নতুন না হলেও, ৩০ লক্ষ নারী পাঠকের কাছে আওয়াজটা পৌঁছে গেল। বিপুল সংখ্যক মধ্যবিত্ত শ্বেতাঙ্গ নারী হঠাৎ করে আবিষ্কার করলেন, তারা আসলে অসুখী।

সমাজতন্ত্রের সাথে প্রতিযোগিতার ময়দানে আবার ফিরিয়ে আনা হল 'নারীবাদী আন্দোলন'কে। আগের ঊনবিংশ শতক জুড়ে চলা নারীবাদী আন্দোলনের প্রথম ওয়েভের আপাত সমাপ্তি ঘটেছিল আমেরিকার নারীদের ভোটাধিকার দেবার মাধ্যমে সেই ১৯২০ সালে। ৬০-এর দশকে আবার চাঙা করে তোলা হল ৪০ বছর আগের সেই হাইপ।

[ছ] ১৯৬০ সালেও মেয়েদের ১ম বিয়ের গড় বয়স ছিল ২০.৩ আর পুরুষের ২২.৮ বছর। আর ২০১০ সালে এসে মেয়েদের ২৫.৮ আর ছেলেদের ২৮.৩ বছর। মোটামুটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পশ্চিমা বিশ্বে এবং গত শতকের শেষ চতুর্থাংশে এশিয়ায় বিয়ে পেছানোর হিড়িক ওঠে।

১৯৬০-১৯৮০ পর্যন্ত সময়কালকে ইউরোপে বলা হয় যৌনবিপ্লব (sexual revolution)। এতোকাল চলে আসা যৌনতার ধারণাকে ছুঁড়ে ফেলে উদ্দাম যৌনতায় প্রবেশ করে ইউরোপ-আমেরিকা।

- নারীবাদী আন্দোলনের ২য় ওয়েভ (১৯৬৩ থেকে)
- এলজিবিটি আন্দোলন ও ১৯৭৩ সালে সমকামিতাকে মনোরোগ তালিকা থেকে বাদ দেয়া
- ১৯৬০ সালে বাজারে এলো জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি

- বিবাহিতা ও অবিবাহিতাদের জন্য সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জন্মনিয়ন্ত্রণের অনুমোদন
- ১৯৭৩ সালে Roe vs Wade কেস দ্বারা নারীর প্রজননের স্বাধীনতা ও গর্ভপাতের অধিকার অর্জন
- ১৯৬৯ সালে ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে প্রথম পাশ হয় no-fault divorce আইন।
- ১৯৬৮ সালে মনোরোগের তালিকা থেকে হস্তমৈথুন-কে বাদ দেয়া হয়। আর ১৯৬৯ সালে প্রথম প্রকাশ্যে থিয়েটারগুলোতে রিলিজ পায় প্রথম adult erotic film... পরিচালক Andy Warhol-এর Blue Movie. শুরু হয়ে গেল ১৫ বছর ব্যাপী (১৯৬৯-১৯৮৪) বিখ্যাত Golden Age of Porn.

এই ৩০ বছরে এক তো ওয়ার্কফোর্সে নারীকে আনা হল ব্যাপকভাবে। আর দুই, তৈরি হল বিপুল নতুন নতুন বাজার, যা আগে ছিলো না। বেড়ে গেল শ্রমিক, বেড়ে গেল ভোক্তা, বেড়ে গেল চাহিদা। দাঁড়িয়ে গেল—

- বছরে ৯৭০০ কোটি ডলারের পর্নব্যবসা
- যৌনকাজে ব্যবহৃত মানব পাচার থেকে ৯৯০০ কোটি ডলার
- পতিতাব্যবসা বছরে ১৮৬০০ কোটি ডলারের
- কেবল Erectile Dysfunction Market-ই ২০২৪ সালের মধ্যে ৪২৫ কোটি ডলারে পৌঁছবে বছরে।
- যৌনবাহিত রোগের ওষুধের মার্কেট ২০২৫ সালের মধ্যে হবে ৮৬০০ কোটি ডলার।
- ২০২৪ সালে পুরুষ-টু-নারী সার্জারির মার্কেট গিয়ে দাঁড়াবে বছরে ৯৭ কোটি ডলারে (reassignment surgery)।
- জন্মনিয়ন্ত্রণ পিলের মার্কেট ১৮৩৬ কোটি ডলার

এই নৈতিকভাবে ভেঙে পড়া সভ্যতার একটি অসুখ নিয়ে লিখেছেন লেখিকা— যে সভ্যতায় মানবভ্রূণ হত্যাকে 'নাগরিক অধিকার' (civil rights) বলে বিবেচনা করা হয়। অথচ, 'কেবল মেয়েশিশু বলে গর্ভপাত করানো হচ্ছে'— এই কথাটাই বার বার সামনে আনা হচ্ছে, ৩য় বিশ্বকে 'অসভ্য' প্রমাণ করার চেষ্টা হিসেবে। যাতে ১ম বিশ্বকে আলোকিত-সভ্য এবং তাদের মতবাদ-জীবনাচরণকে অবশ্য-গ্রহণীয় হিসেবে প্রচার করা যায়। লেখিকা নিজেও এই উপমহাদেশীয় বৈষম্যমূলক মাইন্ডসেটেরই সমালোচনা করেছেন। কিন্তু আরেকটু বিস্তৃতভাবে নজর করলে দেখা যায়, তথাকথিত উন্নত বিশ্বেও প্রায় সমান তালে চলছে গর্ভপাত—

- **২০০৩ সালের এক স্টাডিতে এসেছে, উন্নত বিশ্বে গর্ভপাতের হার হাজারে ২৬ জন নারীতে। আর আমাদের হার হাজারে ২৯ জন নারীতে। খুব বেশি পার্থক্য না।**
- **ভারতে গড়ে প্রতি বছর প্রায় ৬ লাখ মেয়েশিশু দুনিয়ার আলো না দেখেই চলে যায় , আর ওদিকে ২০১৯ সালে আমেরিকায় গর্ভপাত হল ৩,৪৫,৬৭২ টা । জনসংখ্যার অনুপাত হিসেব করেন—**
- **ভারতে ১২০ কোটি, আমেরিকায় ৩৩ কোটি। তাহলে আঙুল কেন এদিকে? সাড়ে ৬ কোটি জনসংখ্যার**
- **বৃটেনে ২০১৯ সালে গর্ভপাত হয়েছে ২,২৩,১০২ টা । যার ৮১% করেছে অবিবাহিত মেয়েরা । বৃটেনে টোটাল গর্ভধারণের ২৪% ফেলে দেয়া হয় (INDUCED ABORTION)। চালুনি বলছে: সুঁই, তোমার পেছনে কেন ফুটো। নিজেদের অসুস্থ যৌন-উন্মত্ত সভ্যতার ঘা ঢাকতে চোরের মায়ের বড় গলা শুনতে পাই আমরা— '৩য় বিশ্বে কন্যা ভ্রূণহত্যা করা হয়', '৩য় বিশ্ব নারী-বৈষম্য করে' ইত্যাদি।**

মানুষের ইতিহাসে এমন সময় কখনোই আসেনি যে, pregnancy এত ব্যাপকভাবে unwanted হয়ে গেছে। pregnancy-কে একটা রোগ মনে করা হচ্ছে, যার রিস্ক এড়াতে প্রয়োজন পড়ছে ব্যবস্থা নেবার। পিল নিয়ে শুরুর দিকের সাফাইগুলো যদি পড়েন দেখবেন, পিল খাবার রিস্ক-কে তুলনা দেয়া হচ্ছে গর্ভধারণের রিস্কের সাথে। বর্তমান জাতিরাষ্ট্রব্যবস্থা একটা কৃত্রিম ব্যবস্থা। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা একটা কৃত্রিম ব্যবস্থা। বিভিন্ন কৃত্রিম ব্যবস্থা মিলে প্রাকৃতিক ব্যবস্থাকে ভিলেন বানিয়ে ফেলেছে। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে— 'দশচক্রে ভগবান ভূত'। ভগবান নামে এক লোককে তার চাচা সম্পত্তির লোভে ভূত বলে সাব্যস্ত করেছিল। এখনকার অবস্থাও তা-ই। জাতীয়তাবাদী সীমানা, পুঁজিবাদের কৃত্রিম প্রতিযোগিতা সৃষ্টি ও সবকিছুকেই ব্যবসা বানিয়ে ফেলা, ভোগবাদী মানসিকতা, স্বাধীনতার নারীবাদী ধারণা মিলে গর্ভধারণ ও জন্মদান-কেই বিভীষিকা বানিয়ে ফেলেছে। পশ্চিমা নৈতিকতার নতুন সংজ্ঞায়— *অনাগত শিশু তো nonexistence। একজন nonexistence-এর ক্ষতির আশঙ্কায় জীবিত মানুষের হিউম্যান রাইটসে (পড়ুন 'ফুর্তি') হস্তক্ষেপ করা যাবে না।* এই নৈতিকতায় গর্ভপাত 'তেমন কিছু না'।আমাদের পুরো চিত্রটায় ফোকাস করা দরকার। পশ্চিম থেকে আমদানি করা হচ্ছে তাদের সভ্যতার দর্শন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন সমকামিতাকে বৈধ করার জন্য গাম্বিয়াকে দিতে চেয়েছিল ৩০ মিলিয়ন ইউরো, গাম্বিয়া নেয়নি। বাংলাদেশ গত বছর মে মাসে তাদের থেকে নিয়েছে ৪২৮ কোটি টাকা, শিক্ষা খাতে সংস্কারের জন্য । বুঝা যায়? কী সংস্কার চায় তারা? পশ্চিমা শিক্ষা দর্শনের একটা উদ্দেশ্যই হল—

> 'পাশ্চাত্য সভ্যতার মহান ধারণাগুলো (এনলাইটেনমেন্ট থেকে পাওয়া) যেন বুঝিয়ে দেয়া যায় শিক্ষার্থীদের। কেননা এই আইডিয়াগুলো চিরন্তন, ধ্রুব সত্য এবং সর্বযুগের সমাধান'।

এই কর্পোরেট পুঁজিপতিরা নিজের দেশকে বাজার বানিয়েছে পরিবার-সমাজ সব ধ্বংস করে। উপনিবেশের মওকায় ঢুকে পড়েছে ৩য় বিশ্বে। উপনিবেশ ছেড়ে গেলেও নিজেদের বিকৃত অসুস্থ মতবাদগুলো এভাবেই ঢুকিয়ে দেয় জাতিসংঘের সিরিঞ্জ দিয়ে, অনুদান-ঋণের মোড়কে। অনিবার্যভাবে আমাদের সমাজ-পরিবার-প্রজন্ম তাদের মতোই ধুঁকছে। তাদের প্রতিটি রোগ আমাদের মাঝে সংক্রমিত হয়েছে। সামনের দিনগুলো আরও কঠিন। পশ্চিম থেকে যে শব্দগুলো আসে, সেগুলো সবই একেকটা দর্শন বহন করে। আধুনিকতা, উদারনীতি, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, নারীমুক্তি, প্রগতি। প্রত্যেকটা কথারই আছে একটা পশ্চিমা সংজ্ঞা, পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি, পশ্চিমা দর্শন। যা স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে মেনে নিতে তারা আমাদের বাধ্য করছে। শিক্ষার নামে, কারিকুলামের ভিতর দিয়ে এগুলো আমাদের শেখাচ্ছে। আর জাতিসংঘের নামে আমাদের দেশগুলোতে, আমাদের সংবিধানগুলোতে, আমাদের সরকারগুলোকে বাধ্য করছে প্রয়োগ করতে।

তবে এখনও সময় ফুরিয়ে যায়নি। আমাদের আশেপাশের মানুষদের মাঝে ব্যাপকভাবে দাওয়াহ করতে হবে। এই কথার যে— অবশ্যই পশ্চিমা সভ্যতার বস্তুগত সাফল্য বিজ্ঞান-প্রযুক্তি আমরা ব্যবহার করব। কিন্তু পশ্চিম থেকে দীন (জীবন পরিচালনার নীতিমালা) একজন মুসলিম নিতে পারে না। পশ্চিমের ভালোমন্দের মাপকাঠিতে জীবনকে চালাতে পারে না। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের পুঁজিবাদ-তাড়িত পাশ্চাত্য সমাজ ও পাশ্চাত্য সমাজ প্রভাবিত বিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতি-বিরোধী। মানুষের বায়োলজি-সাইকোলজি বিরোধী, পরিবেশ-ইকোলজি বিরোধী, মানুষের স্বাভাবিক একতা ও সংগঠন (পরিবার-সমাজ) প্রবণতার বিরোধী। যত দিন যাচ্ছে মানবজাতিকে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এই মুনাফা-চোখো সভ্যতা।পশ্চিমা সভ্যতা কৃত্রিম দীন (জীবন ব্যবস্থা)। আর ইসলাম ফিতরাতের (সহজাত স্বভাবসুলভ) দীন। পশ্চিমা সভ্যতার লক্ষ্য মুনাফা আর ভোগ, যার হাতিয়ার জুলুম-বঞ্চনা। ইসলামের লক্ষ্য ইহকাল-পরকালে মুক্তি, হাতিয়ার ইনসাফ ও অধিকার। পশ্চিমা সভ্যতা নারী-পুরুষের বায়োলজি-বিরুদ্ধ, সাইকোলজির বিপরীত। পশ্চিমা সমাজ, সমাজতত্ত্ব, সামাজিক ধারণা এবং 'সামাজিক ধারণা-প্রভাবিত যেকোনো নতুন গবেষণা' থেকে যত দূরে থাকতে পারবেন তত আপনার জীবন সুন্দর হবে। পুঁজিবাদের করাল থাবা ও নিষ্পেষণ আপনি, আপনার দেহ-মন, আপনার পরিবার তত নিরাপদ থাকবেন। সুখী ও তৃপ্তিময় জীবন কাটাবেন। আর বিপরীতে যত আপনি ওহী-ঘেঁষা (কুরআন-হাদিস) জীবন কাটাবেন, তত নিশ্চিন্ত-ফুরফুরে জীবন কাটবে, পরকালেও থাকবেন টেনশন-ফ্রী।

এই সহজ কথাটা ওরা বুঝবে ট্রিলিয়ন ডলারের গবেষণা শেষে।
আর আপনি-আমি বুঝব আমাদের অমূল্য ঈমানের চোখে।
আলহামদুলিল্লাহি আ’লা দীনিল ইসলাম।